মাতৃপ্রসঙ্গ

কোঠারে কুটিরবাসিনী

তপতী ধর

প্রকৃতিদেবী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তুলেছেন এই বিশাল ভারতবর্ষকে। বহির্মুখীন মানবসভ্যতা শহরগুলিকে পরিণত করেছে ইট-কাঠ-পাথরের স্তূপে, কিন্তু এখনও মানুষের আগ্রাসী লোভ ভারতের বহু গ্রামের সৌন্দর্যকে নষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। শ্যামল কোমল সেইসব গ্রামের লীলাভূমি আর সহজ সরল সেখানকার বাসিন্দারা। এমনি এক মর্ত্যভূমির স্বর্গে পৌঁছে গেলাম ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮-এ। দিনটি ছিল সোমবার।

সর্বভারতীয় সারদা সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন ছিল ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর ওড়িশার কটকে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মস্থান হওয়ার সুবাদে এই প্রাচীন শহরটির নাম আজ সারা পৃথিবী জানে। শ্রীশ্রীমা সারদার পাদস্পর্শেও ধন্য হয়েছিল কটক, ১৮৮৮ সালের নভেম্বরে, তাঁর পুরী যাওয়ার পথে। কয়েক বছর পর কটক শহর থেকে একশো কুড়ি কিলোমিটার দূরে ওড়িশার এক প্রত্যন্ত গ্রামেও মায়ের শুভাগমন হয়েছিল। ছোট্ট সেই গ্রামটি তাঁর স্পর্শে আজ পবিত্র তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে। গ্রামটির নাম কোঠার।

অধিবেশনের তিনদিনই কার্যকরী সভার পর বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে জনসভা। তাতে উপস্থিত ছিলেন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা এবং শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনীরা। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল জনসভায়। তাঁরা শ্রীমার জীবন ও বাণী আলোচনা করে মাকে জনমনে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেন।

তিনদিনের অমূল্য সংগ্রহ নিয়ে মন যখন মশগুল তখনই সারদা সঙ্ঘ কর্তৃক নির্ধারিত কোঠার ভ্রমণের উদ্দেশ্যে একশো পঁচাত্তর জনের একটি বিশাল দল পাড়ি দিলাম এক ভোরে। সদস্যারা বাসগুলিকে আনন্দমুখরিত করে তুললেন 'জয় মা', 'জয় মা' ধ্বনিতে। চারপাশে নাম না জানা গাছগাছালির সারি। অধিকাংশের পাতা ঝরে পড়েছে পৌষের হিমেল হাওয়ায়, যেগুলি এখনও ঋতুর প্রকোপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করেছে তারা মাথা দুলিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে যাত্রীবাহী বাসগুলিকে। জনশূন্য রাস্তা, দূরে কোথাও কোথাও মাটির ঘর দেখা যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর আজকের সুপ্রভাতে মায়ের চরণচিহ্নিত রাস্তায় আমাদের বাস চলেছে দুর্বার গতিতে।

একসময় গন্তব্যে পৌঁছালাম। এগিয়ে এলেন কোঠার 'শ্রীশ্রীসারদা স্মৃতিমন্দিরে'র কর্মকর্তা শ্রীসমরেশ নিয়োগী, প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার, বি এস এন এল। সংক্ষিপ্ত ভাষায় বললেন শ্রীশ্রীমার কোঠার পদার্পণের ইতিহাস। সেটা ছিল ৫ ডিসেম্বর, ১৯১০। ভক্ত বলরামবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে মা এলেন তাঁদের জমিদারি কোঠারে। সঙ্গে ছিলেন স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী ধীরানন্দ, রামবাবু, গোলাপ-মা, পাগলি মামি ও রাধু। যাত্রা শুরু হয়েছিল কলকাতা থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির রেলে চেপে। ভদ্রক পৌঁছানোর পর তুলসীরামবাবু (স্বামী প্রেমানন্দের বড়ো ভাই) মাকে অভ্যর্থনা করে ভদ্রকের কাছারিবাড়িতে বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দেন।

তারপর সুদীর্ঘ জঙ্গলাকীর্ণ পথ মা ও তাঁর সঙ্গীরা পাড়ি দেন পালকিতে চেপে। বহু পুরোনো সেই পালকিটি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে কোঠারে।

সবাই বিস্ময়বিহ্বল, এই নিরিবিলি গ্রামাঞ্চলে কী করে মা দীর্ঘদিন অতিবাহিত করলেন! জানা গেল জয়রামবাটী, দক্ষিণেশ্বর ও কলকাতা ছাড়া মা অন্য কোথাও (তীর্থস্থান ছাড়া) এত দীর্ঘসময় থাকেননি। মা যে-ঘরে ছিলেন সেটি ছিল সামান্য একটি কুটির।

মায়ের মানসিক স্থিতি সর্বদা অতি উচ্চস্তরে থাকলেও গ্রামের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগ ছিল। তিনি কুটিরের বারান্দায় বসে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতেন। দক্ষিণেশ্বর বা কলকাতায় মায়ের যে-অবগুণ্ঠিত রূপ দেখে ভক্তেরা অভ্যস্ত ছিলেন, এখানে তার কিছু ব্যতিক্রম হল। অনেকসময় মা ঘোমটা খুলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন।

এই কুটিরে থাকাকালে মায়ের মন একদিন সমাধিরাজ্যে বিচরণ করতে থাকে এবং তাঁর উপলব্ধি হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বজীবে সর্বরূপে বিদ্যমান। অন্ধ, খঞ্জরূপে আসলে তিনিই কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁর মন করুণায় দ্রবীভূত হয় এবং আর্তজনের ত্রাণের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। সেই স্থানে আমরা মায়ের শ্রীচরণে প্রণত হলাম।

কুটিরের পাশেই ছিল বলরামবাবুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধেশ্যামের বিগ্রহ এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে ইংরেজরা যাতে বিগ্রহের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য বলরামবাবু কাঁকুড়গাছির রথের জগন্নাথবিগ্রহকে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। আজও এই মন্দিরে নিত্যপূজা, সন্ধ্যারতি ঘটা করে হয়।

মন্দিরের পাশেই যাত্রামঞ্চ, কালের কবলে পড়ে বহুলাংশে ক্ষতবিক্ষত। মঞ্চটি দেখে মন পুলকিত হল এই ভেবে যে, শ্রীশ্রীমা এই মঞ্চে যাত্রাভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেইদিনটি ছিল সরস্বতীপূজার দিন। নিখুঁত পারদর্শিতায় শ্রীশ্রীমার সন্তানেরা সেখানে খুব ঘটা করে সরস্বতীপূজার আয়োজন করেন। পুজোতে না জানি সেদিন গ্রামবাসীরাও কত উৎফুল্ল হয়েছিলেন, কারণ স্বয়ং সারদা-সরস্বতী যে ছিলেন সশরীরে বিদ্যমান! এই পুজোর দিনে আর একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। কোঠারের পোস্টমাস্টার দেবেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় বা কোনও প্ররোচনায় খ্রিস্টান হয়েছিলেন কিন্তু অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন। একথা শ্রীশ্রীমাকে জানান স্বামী ধীরানন্দ ও রামকৃষ্ণ বসু। পাপীতাপী সবাইকে কোল দিতেই তো মায়ের ধরায় আসা! তাই মা অনুতপ্ত দেবেন্দ্রনাথকে কোলে টেনে নেন, শ্রীরাধেশ্যামের চরণামৃত খাইয়ে তাঁকে স্বধর্মে পুনরায় ফিরিয়ে আনেন, দীক্ষাদান করেন এবং প্রসাদস্বরূপ একখানি নতুন কাপড়ও তাঁকে দেন। অনুতপ্তের হৃদয়ে প্রেমের শীতলবারি সিঞ্চন করে মা ধন্য করলেন তাঁকে। সেই বিশেষ দিনে শিলং থেকে আগত সুরেন্দ্রকান্ত সরকার, হেমেন্দ্রকুমার মিত্র, ধীরেন্দ্রকুমার মজুমদার সহ বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ সস্ত্রীক মায়ের কাছে দীক্ষালাভে ধন্য হন। গণ্ডগ্রামে সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর সামনে 'ম্লেচ্ছ'কে দীক্ষাদান সত্যিই এক অসাধারণ বৈপ্লবিক ঘটনা! সেদিনের অজ্ঞ গ্রামবাসীর যা বোধগম্য হয়নি আজ হয়তো তাদের নবপ্রজন্মের কাছে সেই বিপ্লবের যবনিকা উত্তোলিত হচ্ছে। তাই মায়ের স্মৃতিমন্দির রক্ষার্থে তাদের এত উৎসাহ!

সেই রাতেই মা দেখেন যাত্রাভিনয়। উৎকলদেশীয় দুটি বালকের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার সাজে অভিনয়ে মা এত মুগ্ধ হন যে পরদিন আবার সেই একই যাত্রা অভিনীত হয়। ওড়িয়া নিশ্চয়ই মায়ের জানা ছিল না, কিন্তু বালকদের নিখুঁত অভিনয়ে প্রকাশিত রাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্যকেই মা পুনরভিনয়ের সুযোগ দিয়ে পুরস্কৃত করেন। তাছাড়া যেখানে প্রাণের যোগ সেখানে ভাষার ব্যবধান থাকে কি!

সেই বালকদ্বয়ের পূর্বজরা মাকে দীর্ঘ দুমাস কাছে পেয়েছেন। মা বর্তমান মন্দিরের পিছনের বারান্দায় বসে তাঁদের সুখদুঃখের কথা শুনেছেন। তাঁদের দুঃখে অংশীদার হয়েছেন, তাঁদের সুখে হেসেছেন—ভাবতে ভাবতে সেই যাত্রামঞ্চের একাংশে বসে মায়ের সঙ্গসুখ উপলব্ধি করার চেষ্টা করলাম। মনে মনে বললাম, ''মা, তাঁদের কত কাছের মানুষ হয়েছিলে তুমি, আমাকেও সেই সৌভাগ্যের অংশীদার করো মা।''

এবার সবাই স্মৃতিমন্দিরের সদর দরজায় সমবেত

হলেন। সেখানে মায়ের প্রতিকৃতি তোলা হল মায়ের ব্যবহৃত পালকিতে। শঙ্খ, ঘণ্টা, উলুধ্বনিতে মুখরিত হল পরিবেশ। শ্রীনিয়োগী চললেন সেই প্রতিকৃতি নিয়ে গ্রাম পরিক্রমায়। মাতৃনামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে, মাতৃসংগীত ও নাচের উল্লাসে সারদা সঙ্ঘের সকল বোনেরা তাঁর সঙ্গে চললেন। গ্রামের বধূরা ধূপদীপ, অর্ঘ্য নিয়ে এগিয়ে এসে মাকে স্বাগত জানাল। আনন্দধারা বইতে লাগল সমস্ত গ্রাম জুড়ে, জগন্মাতার শুভ আশীর্বাদ যেন ঝরে পড়তে লাগল। গ্রাম পরিক্রমার শেষপর্বে মায়ের ব্যবহৃত বিশাল পুকুরের পাশে সবাই সমবেত হলেন। টলটল করছে পরিষ্কার জল, ফুটে রয়েছে অজস্র শাপলা। আগ্রহী ভক্তেরা পুকুরের জল ও ফুল সংগ্রহ করলেন। ফিরে এসে সবাই নবনির্মিত মন্দিরে বসলেন। সেখানে ভজন-কীর্তন চলছে, অনেকে তাতে অংশ নিলেন।

এবার প্রসাদ পাওয়ার পালা। মন্দিরের ডানপাশে রান্নাঘর এবং তার পাশেই খাওয়ার ব্যবস্থা। পরিবেশন শুরু হল। গরম গরম ভাত, ডাল, তিন-চার পদ তরকারি, চাটনি, অবশেষে পায়সান্ন। রীতিমতো ভুরিভোজ। সবাই পরিতৃপ্ত। কর্মকর্তার কৃতিত্বে সবাই মুগ্ধ কারণ এত প্রত্যন্ত গ্রামে এই বিশেষ ধরনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সত্যিই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তবে এও সত্য যে তাঁরা মার বিশেষ কৃপাধন্য, তাই তাঁদের কাছে সব কাজই সহজ। কিছুক্ষণ মন্দিরে বসে সবাই বিশ্রাম নিলেন, কেউ বা মন্দিরপ্রাঙ্গণে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। পরিণতবয়স্কা সদস্যাদের দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন মায়ের ছোটো ছোটো কন্যা, জাগতিক সব অশান্তিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মায়ের ছোট্ট অঙ্গনে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন।

এরপর মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা কিন্তু মা কি বিদায় দিতে চান কন্যাদের! তাই এক পা এগিয়েই আবার পিছন ফিরে সবাই মাতৃমন্দির দেখতে দেখতে চললেন। মন্দিরটির নাম রাখা হয়েছে 'শ্রীসারদাস্মৃতি মন্দির'। বহু স্মৃতির সম্ভারে পূর্ণ মন্দিরটি দেখার সৌভাগ্যে মন পরিপূর্ণ হল।

একটু শান্তির আশ্রয়, একটু নিরিবিলি, একটি আনন্দময় দিন সবাই চায় কিন্তু কোথায় সেই আশ্রয়, কোথায় আনন্দ! জাগতিক জটিল-কুটিল পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত মন সদা দিশেহারা। বিলাসবহুল জীবনের মধ্যে থেকেও রিক্ত হৃদয়ের হাহাকার তাড়না করে প্রতি মুহূর্তে। আজ এই দৈন্যের যন্ত্রণায় জগৎ বিপর্যস্ত। ভাবতে ভাবতে সেই বারান্দাটির দিকে আবার চোখ চলে গেল যেখানে আনন্দময়ী বসে আনন্দ বিতরণ করেছেন সবাইকে। তাঁরই আঁচলের স্পর্শ এসে লাগল যেন গায়ে।

চলতে চলতে একটি কথা বারবার মনে হচ্ছিল—মা তো অনুকূল প্রতিকূল দুটো অবস্থাতেই কখনও বিচলিত হননি! দারিদ্র্যের পীড়নের কাছে যেমন নত হননি, তেমনি আবার রামনাদের রাজা রত্নভাণ্ডার খুলে দিলে একখণ্ড রত্নও তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। সাম্যাবস্থার মূলমন্ত্র 'নির্বাসনা,' মা তা দিয়ে গেছেন। সর্বহারাকে সর্বদা স্থান দিয়েছেন, জাতপাতের গণ্ডি ভেঙে সকলের হয়েছেন। রিক্ত হৃদয়কে আশা ও আনন্দের ছোঁয়ায় মাধুর্যময় করে তুলেছেন। আনন্দময়ীর জীবনছন্দ স্বার্থহীন আনন্দের নির্মল প্রকাশ। তাই তা স্নিগ্ধ, পবিত্র, সুন্দর।

বাসে উঠে আবার সেই পবিত্র তীর্থকে প্রণাম করে মনে মনে উচ্চারণ করলাম : ''মাগো, তোমার সমস্ত উপদেশ, তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি যেন জীবনে চলার পথে মন্ত্রসম গ্রহণ করতে পারি। তুমি তো স্বমুখে বলেছিলে, 'আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি মা।'... জাগতিক বন্ধনের টানে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলেও তোমার স্নেহের সন্তানকে তুমি তো ভুলবে না মা?''

যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথ দিয়েই বাস চলেছে। দুপাশের তরুলতা সবাইকে মনে হচ্ছে বড়ো আপন। উদাস মন ভাবছে—কেন আরও কিছুক্ষণ মায়ের সান্নিধ্যের স্বাদ নিতে পারলাম না! মনের ভিতরে চলছে অসংখ্য কথার ঢেউ, আর কি কখনও আসা হবে এই স্মৃতিমন্দিরে?

মহানদীর কোলে ঢলে পড়েছে পশ্চিমের সূর্য। সাঁঝের আকাশে দেখা যাচ্ছে দু-চারটে তারা। ব্যস্ত শহরের যানবাহনের আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। পৌষের সন্ধ্যায় এই মহতী অভিযাত্রাকে সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করে পা রাখলাম আবাস শান্তিবিহারে।